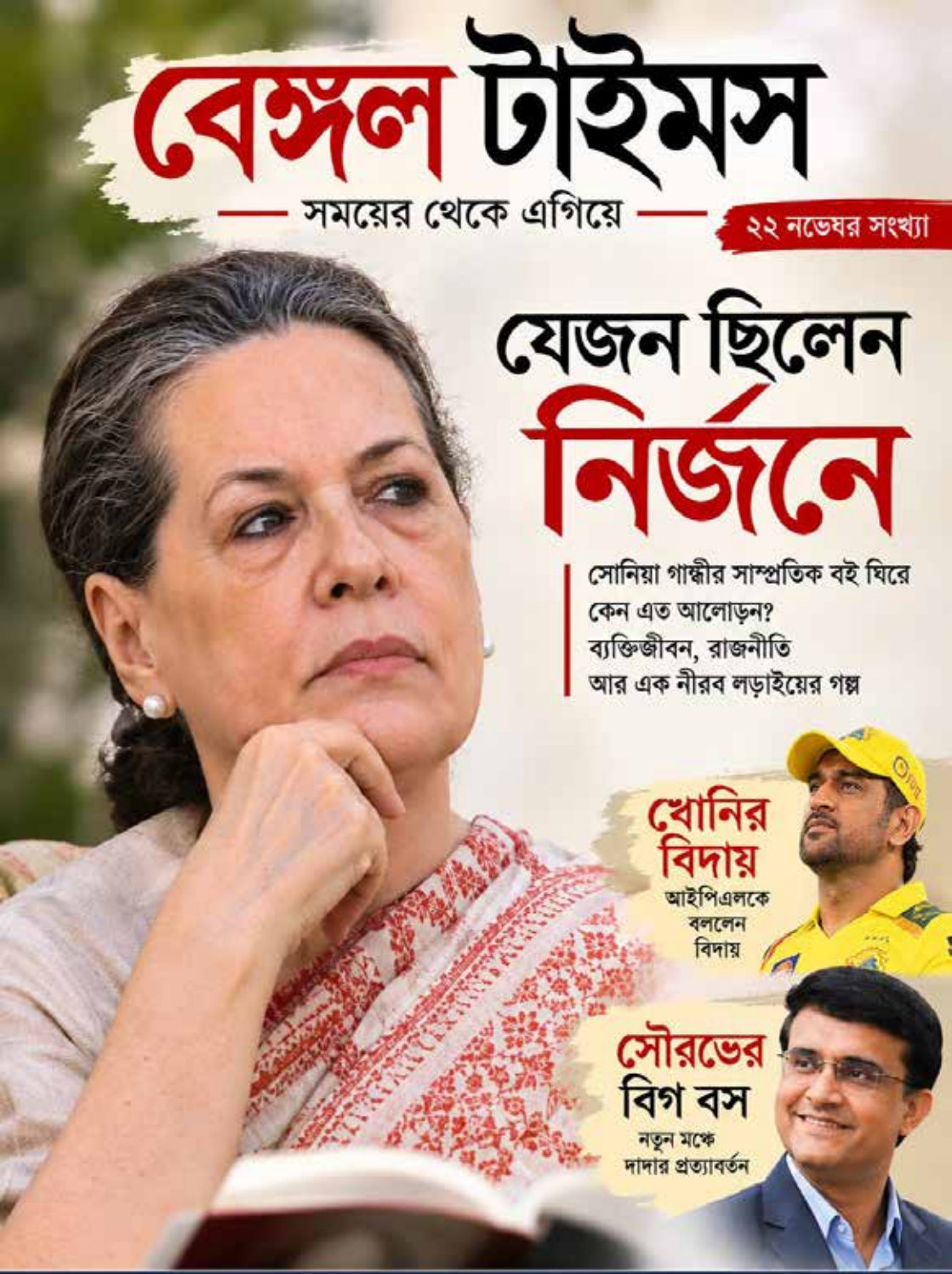
বেঙ্গল টাইমস

— সময়ের থেকে এগিয়ে —

২২ নভেম্বর সংখ্যা



যেজন ছিলেন নির্জনে

সোনিয়া গান্ধীর সাম্প্রতিক বই ঘিরে
কেন এত আলোড়ন?
ব্যক্তিজীবন, রাজনীতি
আর এক নীরব লড়াইয়ের গল্প

ধোনির বিদায়

আইপিএলকে
বললেন
বিদায়

সৌরভের বিগ বস

নতুন মঞ্চে
দাদার প্রত্যাবর্তন

bengaltimes.in | ISSN 2445 5657

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনি

আড়াল ছিল বলেই আলোড়ন উঠছে

❑ **অভিরূপ কুমার**

‘না’ বলে বুকের পাটা লাগে

❑ **স্বরূপ গোস্বামী**

যে ভুল রাজীব করেছিলেন, সেই ভুলই সোনিয়াও করেননি তো!

❑ **অজয় কুমার**

বিশেষ রচনা

অটল–আদবানি জুটিই ভারতীয় রাজনীতির শ্রেষ্ঠ যুগলবন্দি

❑ **বিপ্লব মিশ্র**



ওপেন ফোরাম

ব্যর্থতার এমন উদ্‌যাপন!

❑ **রক্তিম মিত্র**

বিনোদন

বিগ বস! যিনি পারেন, তিনি পারেন

❑ **ধীমান সাহা**

ট্যুর অপারেটর হওয়ার ভূত মাথা থেকে নেমে গেল

❑ **সৌরদীপ সরকার**

আহারে বাহারে

শহরের উপকণ্ঠে আদিবাসী ছোঁয়া

❑ **উত্তম জানা**

খেলা

দায় নেওয়ার বান্দা গম্ভীর নন

❑ নির্মল দত্ত

গ্যালারির রং সেই হলুদই থাকবে

❑ **মুকুল নন্দী**

ভ্রমণ

ভূতের খোঁজে নৈশ অভিযান

শিমূলতলায়

❑ **সৌম্যদীপ সরকার**

অগত্যা সেই চিমনি

❑ **শুভেন্দু দেবনাথ**



bengaltimes.in

ISSN 2445 5657

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন ২৪৪৫ ৫৬৫৭, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

শীতকাহনের বার্তা

যাই যাই হেমন্ত। শীতের আগমনবার্তা এখনও সদর্পে ঘোষণা হয়নি। তবে দু'দিনের বৃষ্টি ও হালকা হিমেল হাওয়ায় শীত যেন বুঝিয়ে গেল, আমি আসছি। এবার শারদ উৎসব ছিল অনেকটাই দেরিতে। স্বাভাবিক নিয়মেই কালী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোও কিছুটা দেরিতে। নভেম্বরের এই শেষ পর্বে এসে উৎসবের পর্ব আপাতত কিছুটা মিটল। যদিও বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণ ছাড়িয়ে কত পার্বণ হয়েছে, তার হিসেব নেই। এখন তো ধনতেরাস, গণেশ পুজো— এগুলোও রমরম করে বাঙালির ক্যালেন্ডারে ঢুকে পড়েছে।

রাজনীতির আঙিনা যেন বারো মাসই সরগরম। আগে পুজোর সময়টুকুতে অন্তত তরজায় বিরতি থাকত। এখন উৎসবের মরশুমেও ছাড় নেই। অহেতুক আস্ফালন, তরজা চলতেই থাকছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খোদ সরকার যেন গায়ে গা পেড়ে ঝগড়ার রাস্তা বেছে নিচ্ছে। যে যেখানে যা পারছেন, নিদান দিচ্ছেন। বইয়ের স্টল ভাঙা, বই পোড়ানোও এখন নাকি রাষ্ট্রবাদের অংশ। এনকাউন্টারের তকমা দিয়ে অভিযুক্তকে শেষ করে ফেলা এখন যেন উদ্‌যাপনের বিষয়। তাঁরা যে আইনরক্ষার শপথ নিয়েছিলেন, সে কথা তাঁরা বেমালুম ভুলে গেছেন। মেডিক্যাল কলেজেও প্রকাশ্যে ভাঙচুর চলছে। কী আশ্চর্য, সেখানে মন্ত্রীরাও কার্যত ভাঙচুরের পক্ষে যুক্তি সাজাচ্ছেন। যে সব কাণ্ডে দলমত

নির্বিশেষে ধিক্কার দেওয়ার কথা, সেসব অপকর্মকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি আসছে। পালাবদলের এত তাড়াতাড়ি এমন এক সামাজিক সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে, এটা অনেকেই ভাবতে পারেননি।

এরই মাঝে প্রকাশিত হল সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিচারণধর্মী বই। জাতীয় রাজনীতির পরিসরে সেই বইকে নিয়ে চলছে জোর চর্চা। যদিও এটি মূলত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার বই, ব্যক্তিজীবনই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, তবু কিছু জায়গায় যেহেতু রাজনৈতিক প্রসঙ্গও এসেছে, স্বভাবতই বিতর্কের পরিসর তৈরি হয়েছে। রিল-মগ্ন সমাজে বই নিয়ে চর্চা হচ্ছে, এটা সবসময়ই স্বাস্থ্যকর। তাই এবারের প্রচ্ছদ-কাহিনিও সেই বইকে ঘিরে। সেইসঙ্গে কার্যত নিঃশব্দে একশো বছরে পা রাখলেন বর্ষীয়ান লালকৃষ্ণ আদবানি। তাঁকে নিয়েও রয়েছে বিশেষ প্রতিবেদন। সৌরভ গাঙ্গুলির বিগ বস বা আইপিএল থেকে এম এস ধোনির অবসর নিয়েও রয়েছে বিশেষ লেখা। এছাড়া, সিনেমা, খেলা, ভ্রমণ, স্পেশ্যাল ফিচার— এসব নিয়মিত বিভাগ যেমন থাকার, তেমনই আছে। শীত আসছে। স্বভাবতই শীত সংক্রান্ত বেশ কিছু লেখা আগামী সংখ্যাগুলোতে দেখা যাবে। সেইসঙ্গে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি— পরপর দু'মাসে অন্তত একটি করে স্পেশ্যাল ভ্রমণ সংখ্যা করার পরিকল্পনাও আছে।

স্বরূপ গোস্বামী
সম্পাদক,
বেঙ্গল টাইমস



আড়াল ছিল বলেই আলোড়ন উঠছে

অভিরূপ কুমার

শুরুতেই অকপটে স্বীকার করা যাক, সোনিয়া গান্ধীর বই প্রকাশিত হলেও এখনও আমার পড়া হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে পড়া হবেই, এমনটাও হলফ করে বলতে পারছি না। তাই এই লেখা কখনই বুক রিভিউ নয়। কিন্তু বইয়ের বিষয় কী, সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে। গত কয়েকদিন এত লেখালেখি হয়েছে, চ্যানেলে, ইউটিউবে এত আলোচনা হয়েছে, তারপর আর বিষয়

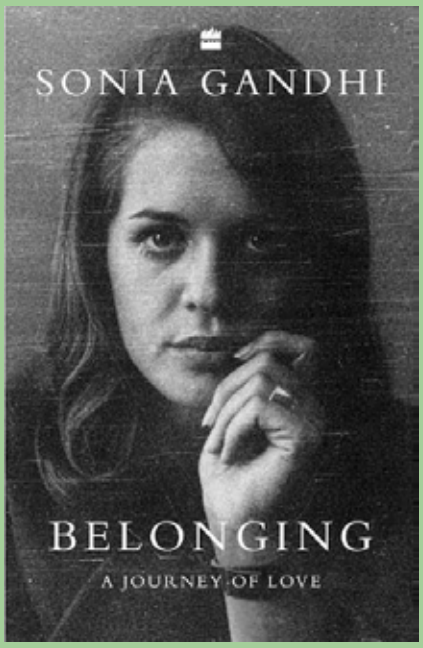


অজানা থাকার কথাও নয়।

কোনও বই প্রকাশের আগেই এতটা আগ্রহ খুব একটা দেখা যায় না। এই বই যত না আত্মজীবনী, তার থেকে বেশি স্মৃতিকথা। স্মৃতির সরণি বেয়ে হাঁটতে গিয়ে অনেক ঘটনাকে ছুঁয়ে গেছেন। ইতিহাসের নানা বাঁকে অল্পবিস্তর আলো পড়েছে। অনেকে অনেক প্রসঙ্গ নিয়ে হইচই করছেন। কেউ বলছেন, এটা লেখেননি কেন, ওটা লেখেননি কেন। সোনিয়া গান্ধী কোনও ইতিহাস লিখতে বসেননি। তাঁর যেটুকু লেখা দরকার মনে হয়েছে, সেটুকুই তুলে ধরেছেন।

Belonging: A Journey of Love রীতিমতো চর্চার কেন্দ্রে। প্রকাশক মার্কেটিংয়ের স্বার্থে কিছু কিছু অংশকে বাজারে আনছেন। তা নিয়ে মিডিয়ায় হইচই হচ্ছে। যে কোনও বইকে ঘিরেই এমন প্রচার কৌশল দেখা যায়। কিন্তু সব বই তো আলোড়ন তোলে না। কিন্তু কেন এই আগ্রহ? সোনিয়া গান্ধী কি এমন কোনও অজানা রাজনৈতিক রহস্যের পর্দা ফাঁস করেছেন? নাকি তাঁর জীবনের এমন কিছু কথা সামনে এসেছে, যা এতদিন জানার সুযোগ হয়নি?

আসলে সোনিয়াকে নিয়ে কৌতূহলের একটা বড় কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব। তিনি



এমন একজন মানুষ, যিনি দীর্ঘদিন দেশের রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে থেকেও নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালে রাখতে চেয়েছেন। প্রকাশ্যে খুব বেশি কথা বলেন না। নিজের আবেগ, অভিমান, ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা সহজে প্রকাশ করেন না। রাজনীতির মঞ্চেও তাঁর চলাফেরায় একটা সংযম, সৌজন্য এবং ভদ্রতার ছাপ বরাবরই লক্ষ করা গিয়েছে। এই কারণেই তাঁর নিজের মুখে নিজের জীবনের গল্প শোনার আগ্রহ এত বেশি।

সোনিয়ার বইয়ের নাম ‘Belonging’। অর্থাৎ আপন হয়ে ওঠা, নিজের জায়গা খুঁজে পাওয়া। নামের মধ্যেই যেন লুকিয়ে রয়েছে তাঁর জীবনের মূল সুর। ইতালির এক ছোট শহরে জন্ম। সেখান থেকে ইংল্যান্ডে পড়তে আসা। ১৯৬৫ সালে কেমব্রিজে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে পরিচয়। তারপর প্রেম, বিয়ে এবং ভারতবর্ষে চলে আসা। ১৯৬৮ সালে ভারতে পা রাখার পর শুরু হয় সম্পূর্ণ অন্য এক জীবন। যে পরিবারে তিনি এলেন, সেটি শুধু একটি রাজনৈতিক পরিবার নয়, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের সঙ্গেও যার গভীর সম্পর্ক।

শাশুড়ি ইন্দিরা গান্ধী। স্বামী রাজীব গান্ধী। পরিবারের অন্য সদস্যদের ঘিরেও জাতীয় রাজনীতির নানা ঘটনা। কিন্তু সোনিয়ার কাছে এই মানুষগুলি শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন তাঁর আপনজন।

বইয়ে সেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাই বেশি করে উঠে এসেছে। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, সন্তান রাহুল ও প্রিয়াঙ্কাকে বড় করে তোলা, পরিবারের ভিতরের নানা মুহূর্ত, সুখ-দুঃখ, অভিমান। সোনিয়া জানিয়েছেন, এতদিন নিজের মনের কথাগুলি নিজের মধ্যেই রেখেছিলেন। এবার সেই ব্যক্তিগত জগৎকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

এই বইয়ের অন্যতম আকর্ষণ এখানেই। ইতিহাসের পরিচিত চরিত্রগুলিকে তিনি দেখিয়েছেন পরিবারের একজন



সদস্যের চোখ দিয়ে। তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে থাকা মানুষটিকে চিনতে চেয়েছেন। একটু একটু করে ভারতের জল-হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেছেন। সোনিয়ার জীবনেও একের পর এক কঠিন আঘাত এসেছে। ১৯৮০ সালে বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড। তারপর ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধীর মৃত্যু। বিশেষ করে রাজীবের হত্যাকাণ্ড তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যে গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখতে চাননি। দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব এলেও বারবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দায়িত্ব নিতে হল। তখন মোটেই কংগ্রেসের সুদিন নয়। কংগ্রেসের দুর্দিনে দলের হাল ধরলেন তিনি। দীর্ঘ সময় ধরে দলকে নেতৃত্ব দিলেন। একসময় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে দেশের রাজনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন। দলের মধ্যে ঝড়ঝাপটা সামলালেন। তাঁর আগমন সবাই যে খুব খোলা মনে মেনে নিয়েছিলেন, এমন নয়। দলের মধ্যে ইতিউতি কানাঘুসো যেমন ছিল, তেমনই একসময় তাঁকে উদ্দেশ্য করে তিন বিদ্রোহী নেতার খোলা চিঠিও বেরিয়ে গেল। নিজের ব্যক্তিত্ব, ক্যারিশ্মা দিয়েই সেই ঝড় সামলেছেন। আবার সেই কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় এল, সবাই যখন ধরেই নিয়েছেন যে তিনিই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী, তখনই সরে দাঁড়ালেন। ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। অন্তত ভারতীয় রাজনীতিতে এমন নজির নেই।

তাঁর জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হলেন মনমোহন সিং। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এই

সিদ্ধান্তের গুরুত্ব কম নয়। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ সামনে এসেছে, অথচ সেই পদ গ্রহণ করলেন না দলের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী। রাজনীতিতে যেখানে ক্ষমতার জন্য এত টানাপোড়েন, সেখানে এমন সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী।

সোনিয়া নিজেও জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রশ্নে তাঁর সন্তান রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার উদ্বেগ ছিল। বাবার মতো মাকেও হারানোর আশঙ্কা তাঁদের মনে কাজ করেছিল। সেই পারিবারিক উদ্বেগও তাঁর সিদ্ধান্তের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৯১ সালে, রাজীবের মৃত্যুর পরই দলের হাল ধরার ডাক এসেছিল। সেদিনও সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই প্রস্তাব।

অথচ, সবাই জানতেন, ২০০৪-এ সরকারের চালিকাশক্তি ছিলেন তিনিই। তাঁকে না জানিয়ে মনমোহন কোনও বড়সড় সিদ্ধান্ত নিতেন না। দলীয় সভানেত্রী হিসেবে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছেন, ইউপিএ সরকারকে রাজনৈতিক দিশা দেখিয়েছেন। কিন্তু নিজে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেননি। ক্ষমতার কেন্দ্রের কাছাকাছি থেকেও সেই সর্বোচ্চ পদ থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম স্বতন্ত্র পরিচয় হয়ে রয়েছে।

তবে সোনিয়া নিজে বইটিকে রাজনৈতিক আত্মপক্ষ সমর্থনের দলিল হিসেবে দেখতে চাননি। তাঁর কথায়, এটি রাজনৈতিক বই নয়, ব্যক্তিগত বই। পরিবারের মানুষগুলিকে তিনি যেভাবে চিনেছেন, তাঁদের ভালো-মন্দ, সাফল্য-ব্যর্থতা, আবেগ ও দুর্বলতা—সবকিছুই নিজের মতো করে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

বইয়ের নামের মতোই এর কেন্দ্রে রয়েছে ভালোবাসা, হারানোর বেদনা এবং একটি দেশকে নিজের করে নেওয়ার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।

এই বইয়ের প্রচারে মূলস্রোত সংবাদমাধ্যমের একতরফা কোনও উচ্ছ্বাস ছিল, এমন বলা যাবে না। বরং তার মাঝেই কিছুটা খোঁচা, কিছুটা কুৎসার উপাদান ছিল। কিন্তু বইটি নিজের মতো করেই আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে। রাজনৈতিক মতাদর্শের বাইরে গিয়েও মানুষ জানতে চেয়েছেন, এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের আড়ালে থাকা মানুষটির গল্প।

কংগ্রেস আজ আর আগের জায়গায় নেই। একসময় যে দল দেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, আজ তাকে নানা রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কিন্তু দলীয় শক্তি কমে যাওয়া আর কোনও নেতার প্রতি মানুষের ব্যক্তিগত

শ্রদ্ধা কমে যাওয়া এক কথা নয়। সোনিয়া গান্ধীর ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি স্পষ্ট।
তাঁর রাজনীতির সঙ্গে কেউ একমত হবেন, কেউ হবেন না। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ সংযম, ব্যক্তিগত শোক সামলে উঠে দাঁড়ানো, ক্ষমতার সর্বোচ্চ পদকে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত—এই বিষয়গুলি তাঁকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত হয়তো সোনিয়ার বইয়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ কোনও রাজনৈতিক চমক নয়। বরং এক নারীর জীবনসংগ্রামের গল্প। যিনি অন্য একটি দেশ থেকে এসেছিলেন, একটি পরিবারকে ভালোবেসেছিলেন, সেই পরিবারের একের পর এক মানুষকে হারিয়েছেন, তারপরও সেই দেশকেই নিজের দেশ বলে গ্রহণ করেছেন।

রাজনীতির মঞ্চে তাঁর পরিচয় অনেক। কংগ্রেস সভানেত্রী, ইউপিএ চেয়ারপার্সন, সাংসদ, দেশের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই সব পরিচয়ের বাইরেও একজন মানুষ আছেন। যাঁর জীবনে ভালোবাসা আছে, হারানোর যন্ত্রণা আছে, দায়িত্ব আছে, আর আছে নিজের মতো করে বেঁচে থাকার এক নিরন্তর চেষ্টা। সম্ভবত সেই মানুষটিকেই এতদিন জানতে চেয়েছিল ভারত।

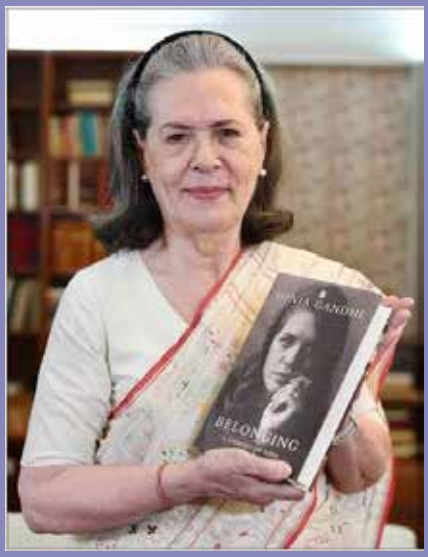


ক্ষমতা অনেকেই পেয়েছেন। ক্ষমতার জন্য অনেকেই লড়েছেন। কিন্তু ক্ষমতা যখন হাতের নাগালে, তখন স্বেচ্ছায় এক পা পিছিয়ে আসার দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। সোনিয়া গান্ধীর জীবনকে তাই শুধু রাজনীতির মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। হয়তো এই কারণেই তাঁর বই নিয়ে এত আগ্রহ। কারণ মানুষ শুধু একজন রাজনীতিকের কথা জানতে চায় না, জানতে চায় সেই মানুষটির কথাও, যিনি দীর্ঘদিন নিজেকে আড়ালে রেখেছিলেন।

কখনও কখনও, আড়ালে থাকা মানুষের গল্পই সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তোলে।

‘না’ বলতে বুকের পাটা লাগে

স্বরূপ গোস্বামী



দিনটা ১৯৯১ এর ২২ মে। আগের রাতে নিহত হয়েছেন রাজীব গান্ধী। তখনও অন্ত্যেষ্টি হয়নি। দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচনের আবহ। কংগ্রেস নেতৃত্ব জরুরিকালীন আলোচনায় সিদ্ধান্ত নিলেন, সোনিয়া গান্ধীই হবেন কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি। প্রস্তাব গেল দশ জনপথে। সেই সন্ধেতেই সেই প্রস্তাব সবিনয়ে ফিরিয়ে দিলেন সোনিয়া। স্বামী হারানোর যন্ত্রণা, কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, সেই সময়েই নিলেন সবথেকে সাহসী এক সিদ্ধান্ত।

ভোট পর্ব চুকে গেল। কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও সরকার গঠনের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে। কংগ্রেস থেকেই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন, এটা পরিষ্কার। ফের প্রস্তাব গেল দশ জনপথে। এতদিনে হয়তো শোক সামলে উঠেছেন। এখন হয়তো দায়িত্ব নিতেও পারেন। কিন্তু সেদিনও ‘না’ বলতে দু’বার ভাবেননি। প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন নরসীমা রাও।

সরকার নিজের নিয়মে চলছে। কিন্তু বারেবারেই অনুগামীরা ভিড় করছেন তাঁর কাছে। একটাই আর্জি, ম্যাডাম, আপনি দায়িত্ব নিন। কিন্তু তিনি বারবার ফিরিয়েই দিয়েছেন। অবশেষে এলেন, সময়টা ১৯৯৮। ততদিনে যুক্তফ্রন্ট সরকারেরও



পতন ঘটেছে। কেন্দ্রে বাজপেয়ীর সরকার। প্রথমে তের মাস, পরে পাঁচ বছর। ২০০৪ এর ভোটে কংগ্রেসের মুখ কে? অবশ্যই সোনিয়া গান্ধী। সবাই জানতেন, জিতলে তিনিই প্রধানমন্ত্রী। কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে যেমন দ্বিধা ছিল না। তেমনই বিরোধীদের মধ্যেও তেমন সংশয় ছিল না। মাঝে শরদ পাওয়ার, পিএ সাংমা, তারিক আনোয়াররা বিদ্রোহী হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই তাঁদের সেই বিদ্রোহ যেন মিইয়ে গেল। শুরুতে কয়েকদিন শিরোনাম দখল করলেও জনমানসে তাঁরা ক্রমশ মিলিয়েই গেলেন। ২০০৪ এর আগে তাঁরাও মিনমিন করে বলতে শুরু করলেন, সোনিয়া প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁদের আর কোনও আপত্তি নেই।

নির্বাচনে দুরন্ত জয়ও এল। সঙ্গে বামেদের সমর্থন তো ছিলই। বামেরা ঠিক করলেন সরকারে যাবেন না। বাইরে থেকে সমর্থন করবেন। তবে প্রধানমন্ত্রীত্বের ব্যাপারে তাঁদেরও বাজি সেই সোনিয়াই। উমা ভারতী, সুষমা স্বরাজরা মস্তক মুণ্ডন করার হুমকি দিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই হুমকি হালে পানি পেল না। অর্থাৎ, কার্যত ফাঁকা মাঠ। কিন্তু গোটা দেশকে চমকে দিয়ে সোনিয়া ঘোষণা করলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন না। ‘অন্তরাত্মা কি পুকার’ এই বাক্যটাই ব্যবহার করেছিলেন দশ জনপথের ম্যাডাম।

তাহলে কে? অনেকে বলতে শুরু করলেন, তিনিই হবেন, একটু দর বাড়াচ্ছেন। দলের মধ্যে নিজের গুরুত্বহ আরও বাড়াতে চাইছেন। দুদিন ধরে চলল আলোচনা। নির্যাস একটাই, ম্যাডাম, দেশ সঙ্কটে। এই সময় আপনাকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। প্লিজ রাজি হয়ে যান। বাম-সহ অন্যান্য শরিকদের দিক থেকেও আর্জি আসতে



লাগল, আপনাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু তিনি অনড়। কিছুতেই ওই চেয়ারে বসবেন না। নানা নাম যেমন ভেসে উঠল, তেমনই নানা প্রসঙ্গও উঠে এল। কেউ ভাবলেন প্রণব মুখার্জির কথা। কেউ ভেবে নিলেন রাহুল গান্ধীর কথা। কিন্তু মনমোহন সিং যে প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, কোনও মূলস্রোত মিডিয়াতেই এমন কোনও আভাস ছিল না। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে নম্র, মৃদুভাষী সর্দারজিকেই এগিয়ে দিলেন সোনিয়া।

আচ্ছা, সোনিয়া যদি প্রধানমন্ত্রী হতেন, কী হত! হয়তো তেমন সফল হতেন না। কিন্তু ক্রাইসিস ম্যানেজার হিসেবে তো প্রণব মুখার্জি ছিলেন। আমলারাও ছিলেন। অন্যান্য মন্ত্রীরাও ছিলেন। মিলিত চেষ্টায় সরকার ঠিকই চলত। তখন না হয় হননি। পাঁচ বছর পর, অর্থাৎ ২০০৯ এ রাহুল অনেক পরিণত। মনমোহন সিংকে একবার আলাদা করে ডেকে বললেই স্বেচ্ছায় কুর্সি ছিড়ে দিতেন। তখন রাহুলকে এগিয়ে দিতেই পারতেন। কোনও স্তরে কোনও বাধাই আসত না।

পরপর দুটো টার্ম ইউপিএ-র সরকার চলেছিল। রাহুল যে কোনও দিন, যে কোনও দপ্তরের মন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু দশ বছর ধরে এই হাতছানি, এই প্রলোভন কিন্তু উপেক্ষা করেছেন। দৃঢ়ভাবে 'না' বলতে পেরেছেন। যাঁরা তাঁকে পাপ্পু বলে উপহাস করেন, যাঁরা সোনিয়াকে 'পাপ্পু কি মা' বলে পরিহাস করেন, তাঁরা কখনও এই সংযম, এই আত্মত্যাগ দেখাতে পেরেছেন? মন্ত্রী হওয়ার জন্য জাতীয় সভাপতির পদও হেলায় ছেড়ে দিয়েছেন। উদাহরণ! বর্তমান ক্যাবিনেটেই এমন চারজনের উদাহরণ পাওয়া যাবে। নীতীন গড়করি, রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা। ছিলেন প্রিন্সিপাল, হয়েছেন প্যারাটিচার। মন্ত্রিত্বের এমনই মহিমা।

গান্ধী পরিবার নিয়ে অনেক সমালোচনাই হতে পারে। কিন্তু সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীরা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বা ক্যাবিনেট মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব হেলায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। এর জন্য বুকের পাটা লাগে বইকি!

যে ভুল রাজীব করেছিলেন, সেই ভুলই সোনিয়াও করেননি তো!



অজয় কুমার

প্রণব মুখোপাধ্যায় কি প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে একটা কথা মনে রাখা দরকার, ভারতীয় রাজনীতিতে প্রণববাবুর মতো প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা খুব কম নেতারই ছিল। ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকেই তিনি ছিলেন দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ও প্রভাবশালী মুখ। মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। নীতিনির্ধারণ থেকে সংসদীয় রাজনীতি, দলীয় সমীকরণ থেকে প্রশাসনিক জটিলতা—সব ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অসাধারণ দখল।

ইন্দিরার মৃত্যুর পর আরও বড় গরিষ্ঠতা নিয়ে এলেন রাজীব গান্ধী। কিন্তু অরুণ নেহরুর মতো কারও কারও পরামর্শে রাজীব ও প্রণবের সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল। বলা হয়, প্রণববাবু নাকি দল ছেড়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা মোটেই তেমন নয়। প্রণববাবুকে দল বহিষ্কার করে। তখন প্রণববাবু নতুন দলও তৈরি করেন। যদিও নির্বাচনী ভরাডুবি হয়েছিল। পরে আবার কংগ্রেসের মূলস্রোতেই ফিরে এসেছিলেন।



নরসীমা রাওয়ের জমানাতেও তাঁর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। প্রথমে ক্যাবিনেটে না থাকলেও দ্রুত তাঁকে বিদেশমন্ত্রী করে আনা হয়। নরসীমাও বুঝেছিলেন, প্রণববাবুকে ক্যাবিনেটের বাইরে রাখা ঠিক রহবে না। আর মনমোহন সিংয়ের দুই দফার ইউপিএ সরকারে তো কার্যত ছিলেন অন্যতম প্রধান ভরসা। অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী—প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বই সামলেছেন। সরকারের যখনই কোনও রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সঙ্কট, তখনই ত্রাতার ভূমিকায় দেখা গিয়েছে প্রণববাবুকে। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের এক নির্ভরযোগ্য ক্রাইসিস ম্যানেজার।

এমন একজন নেতার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতেই পারে। তাতে অন্যায়ের কী আছে? বরং দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকার কথা মাথায় রাখলে সেই আকাঙ্ক্ষাকে অস্বাভাবিক বলার কোনও কারণ নেই।

অনেকেরই ধারণা, ইউপিএ-২ সরকারের সময় মনমোহন সিংয়ের পরিবর্তে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী করা হলে কংগ্রেস সরকার হয়তো এতটা দিশাহীন হয়ে পড়ত না। টুজি কেলেঙ্কারি, কয়লা দুর্নীতির অভিযোগ, একের পর এক

রাজনৈতিক সঙ্কট—এসব মোকাবিলায় প্রণববাবুর অভিজ্ঞতা কাজে আসতে পারত। অবশ্য সেটি একটি সম্ভাবনার কথা, ইতিহাসের অমীমাংসিত প্রশ্ন।

সোনিয়া গান্ধী তাঁর বইয়ে প্রণববাবুর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা লিখেছেন। কিন্তু সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পিছনে যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক পরিশ্রম ছিল, সেটাও তো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। প্রণববাবু প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন—এটা তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। গান্ধী পরিবারের বাইরে থেকেও দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্ব পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন একজন যোগ্য রাজনীতিক। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কিন্তু স্বপ্ন দেখাটাই কি অপরাধ? ২০০৪ এ সোনিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন না, তখনই প্রণববাবুকে দায়িত্ব দেওয়া যেত। হয়তো সোনিয়া নিজের একান্ত অনুগত কাউকে বসাতে চেয়েছিলেন। প্রণববাবু প্রধানমন্ত্রী হতে গান্ধী পরিবারের প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না, এমনটা মনে হয়ে থাকতে পারে। ২০০৭ নাগাদ রাষ্ট্রপতি পদেও তিনিই ছিলেন অটোমেটিক চয়েস। শরিকদের অনেকেই সরাসরি প্রণববাবুর নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে রাষ্ট্রপতি করা হয় প্রতিভা পাটিলকে।

পরে, ২০১২ নাগাদ তাঁকে রাষ্ট্রপতি করা হয়েছিল, নিঃসন্দেহে সেটাও ছিল সর্বোচ্চ সম্মানের পদ। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছনো আর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া তো এক কথা নয়। দেশের প্রশাসন পরিচালনার যে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল, তার যথাযথ ব্যবহার হয়তো অন্যভাবেও হতে পারত।

প্রণববাবুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিস্ময়ের চেয়ে বড় প্রশ্ন তাই অন্য জায়গায়—যে মানুষটি বছরের পর বছর দল ও সরকারকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছেন, তাঁকে শেষ পর্যন্ত সরকারের শীর্ষ দায়িত্ব দেওয়ার কথা কেন গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হল না? প্রণবাবু নাকি বলেছিলেন, সরকারের শীর্ষপদে বদল দরকার। হতেই পারে, তিনি মনমোহনকে সরিয়ে রাহুল গান্ধীকে সামনে আনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যেটা বুঝতে সোনিয়ার ভুল হয়েছিল। ১৯৮৪ তে যে ভুলটা রাজীব করেছিলেন, ২০১০ নাগাদ সেই ভুলটাই কি সোনিয়াও করলেন!



অটল–আদবানি জুটিই ভারতীয় রাজনীতির সেরা যুগলবন্দি

বিপ্লব মিশ্র

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সমস্তরকম যোগ্যতাই তাঁর ছিল। রাষ্ট্রপতিও হতেই পারতেন। কিন্তু উপ প্রধানমন্ত্রী আর বিরোধী দলনেতা হয়েই দৌড় থেমে গিয়েছে লালকৃষ্ণ আদবানির। ভারতীয় রাজনীতিতে সর্দার প্যাটেলের পর লৌহমানব উপমাটা তাঁর জন্যই ব্যবহার হত। কিন্তু দিনের শেষে তিনি যেন কিছুটা ট্র্যাজিক হিরো।

সেই লালকৃষ্ণ আদবানি একশো বছরে পা দিলেন। সেভাবে বোঝাই গেল না। মোদির ১২ বছরের সরকার নিয়ে যতটা হইচই হল, তার পাঁচ শতাংশও দেখা গেল না আদবানির শততম জন্মদিনকে ঘিরে। একশো বছর! মোরারজি দেশাই ছাড়া শীর্ষস্তরের আর কোনও রাজনীতিবিদ

শতবর্ষে এসেছেন বলে মনে পড়ছে না। কেন্দ্রে বিজেপির সরকার। যিনি প্রধানমন্ত্রী, তিনি আদবানির অনুগামী বলেই পরিচিত ছিলেন। নিজের জন্মদিন নিয়ে, নিজের প্রশাসক জীবনের ২৫ বছর নিয়ে তিনি যতটা উত্তাল, গুরু আদবানির জন্মদিনে তাঁর কী চরম নির্লিপ্ততা। শতবর্ষে তাঁর নামে কি কোনও রাষ্ট্রীয় প্রকল্প ঘোষণা হতে পারত না!

জনসঙ্ঘ থেকে বিজেপি। ২ থেকে তিনশোর ওপর আসন। টানা তিনবার দেশের শাসনক্ষমতায় বিজেপি। কিন্তু এর পিছনে যদি কেউ ভিত তৈরি করে থাকেন, তিনি অবশ্যই আদবানি। আজ তিনি একশোর দোরগোড়ায়। বয়সের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মূলস্রোত থেকে অনেক দূরে। তবু লালকৃষ্ণ আদবানি নামটা থেকে যাবে মূল্যবোধের রাজনীতির এক প্রতীক হিসেবে।

জনসঙ্ঘের সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। তারপর বিজেপির জন্ম, দলের সংগঠন গড়ে তোলা, দেশজুড়ে দলকে ছড়িয়ে দেওয়া—প্রতিটি পর্বেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। দীর্ঘ সংসদীয় জীবন। নানা উত্থান-পতন। আদবানির রাজনীতির সঙ্গে অনেকেরই মতের মিল নাও থাকতে পারে। তাঁর কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। কিন্তু বিজেপিকে আজকের জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার পিছনে তাঁর অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধু দল গড়ে তোলা নয়, একের পর এক নতুন নেতাকে সামনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

অটলবিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবানি—ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম সেরা জুটি। দুজনের স্বভাব, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং কাজের ধরন ছিল আলাদা। বাজপেয়ী ছিলেন অনেক বেশি উদার ও নরমপন্থী। আদবানি ছিলেন তুলনায় কঠোর, মতাদর্শের প্রশ্নে অনেক বেশি অনড়। একজনের শক্তি ছিল অসাধারণ বক্তৃতা, অন্যজনের শক্তি সংগঠন তৈরি করা। কিন্তু এই দুই বিপরীত চরিত্রের মানুষের মধ্যে ছিল অসাধারণ বোঝাপড়া।

রাজনীতিতে এমন সম্পর্ক খুব বেশি দেখা যায় না। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাজপেয়ীকে সামনে রেখে কাজ করেছেন আদবানি। আবার বাজপেয়ীও কখনও আদবানির গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। দুজনের মধ্যে মতপার্থক্য



থাকলেও পারস্পরিক শ্রদ্ধায় কখনও ঘাটতি হয়নি। আজকের রাজনীতিতে যেখানে সামান্য মতের অমিলেই নেতাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়, সেখানে বাজপেয়ী–আদবানি জুটি সত্যিই এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ।

আদবানির হাত ধরেই বিজেপিতে উঠে এসেছিল এক নতুন প্রজন্ম। প্রমোদ মহাজন, সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলির মতো নেতারা দলের গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে উঠেছিলেন। রাজনাথ সিংয়ের মতো নেতারাও দলের সংগঠনের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমনকী আজ যিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী, সেই নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক উত্থানের পিছনেও আদবানির ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গুজরাটের রাজনীতি থেকে জাতীয় স্তরে মোদির পরিচিতি তৈরি হওয়ার সময় আদবানি ছিলেন তাঁর অন্যতম রাজনৈতিক অভিভাবক।

১৯৯৬ সালে হাওলায় তাঁর নাম উঠতেই লোকসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, অভিযোগ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সংসদে ফিরবেন না। পরে আদালতের রায়ে অভিযোগমুক্ত হয়ে ফিরে আসেন।

এত ভুরি ভুরি অভিযোগের পরেও যেখানে নেতারা পদ আঁকড়ে থাকেন, সেখানে নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পরই সংসদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন আদবানি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আগে নিজের নামের পাশে থাকা অভিযোগের জবাব দিতে হবে, তারপর আবার সংসদে ফেরা।

রাজনীতিতে এই ধরনের মানসিকতা একেবারেই বিরল।

আজকের সংসদীয় রাজনীতির দিকে তাকালে আরও বেশি করে মনে পড়ে আদবানির মতো নেতাদের কথা। সংসদে আলোচনা কমছে, হইচই বাড়ছে। দলবদল, সরকার ভাঙানো, ক্ষমতার জন্য নানা সমীকরণ বদল— এসব এখন প্রায় নিয়মিত ঘটনা। রাজনৈতিক বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেক সময় নিম্নমানের ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে। ন্যূনতম সৌজন্যটুকুও যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

অথচ, আদবানিকে কখনই এই রাস্তায় হাঁটতে দেখা যায়নি। যখন বিরোধী ছিলেন, তখন সরকারের সমালোচনা করতেন। কিন্তু শালীনতায় কোনও কার্পণ্য ছিল না। অবার যখন সরকারে, তখন জানতেন, সরকারের দায়িত্বটা কী। নিজের অক্ষমতার দায় বিরোধীদের ওপর চাপিয়ে দেননি। কথায় কথায় নেহরুর নাম টেনে আনেননি।

মতের অমিল থাকবে, লড়াই থাকবে, বিরোধিতা থাকবে। কিন্তু তার মধ্যেও কিছু মূল্যবোধ থাকা দরকার। সংসদীয় রীতিনীতি মেনে চলা, প্রতিপক্ষকে সম্মান করা, নিজের সিদ্ধান্তের দায় নেওয়া— এসবও রাজনীতিরই অংশ।

আদবানি সেই অন্য সময়ের প্রতিনিধি। তাঁর সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষমতা, সংসদীয় অভিজ্ঞতা এবং কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সততার দৃষ্টান্ত অবশ্যই সম্মানের দাবি রাখে। এক দশকেরও বেশি সময় সক্রিয় রাজনীতি থেকে অনেকটাই দূরে। এমনকী যে রামমন্দির আন্দোলন তিনি সূচনা করেছিলেন, সেই রাম মন্দির উদ্বোধনের সময় তাঁর ডাক পড়ে না। কিন্তু বিজেপির ইতিহাসে, ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে তাঁর নাম থেকে যাবে।

রাজনীতিতে কে কতটা ক্ষমতা পেলেন, সেটাই শেষ কথা নয়। কে কতটা প্রভাব ফেললেন, কতজন নেতাকে তৈরি করলেন, নিজের কাজের মাধ্যমে কতটা ছাপ রেখে গেলেন, সেটাও বড় কথা।

শতবর্ষে এসে দাঁড়ানো এই প্রবীণ সময়ের নিয়মেই একদিন বিদায় নেবেন। কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে তাঁর অমরত্বের আসন পাতা।



শহরের উপকণ্ঠে আদিবাসী ছোঁয়া

উত্তম জানা

আপনি কখনও ডুমুরের ডালনা খেয়েছেন? বাঁশপোড়া মটন? শুঁটকি মাছ? পোস্ত চিকেন? শুনতে অদ্ভুত লাগতেই পারে। কিন্তু হাতের নাগালেই রয়েছে এমন সব বিচিত্র পদ। না, বহুমূল্য কোনও রেস্তোরাঁয় যেতে হবে না। শহর ছাড়িয়ে দূর কোনও জেলাতেও যেতে হবে না।

ইকো পার্কের পিছন দিকে গেলেই খোঁজ মিলবে এক অন্যরকম রেস্তোরাঁর। নাম ‘ধামসা’। এখানে ঢুকলেই মনে হবে, শহরের কোলাহল পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন কোনও আদিবাসী গ্রামে। অনেকটা জায়গাজুড়ে এর বিস্তার।



গাছপালায় ঘেরা। গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি হয়েছে চেয়ার। টেবিলও অভিনব। চারপাশে ধামসা-মাদলের আবহ, ব্যাকগ্রাউন্ডে আদিবাসী গান। সব মিলিয়ে একেবারে অন্যরকম পরিবেশ।

রেস্তোরাঁর ভিতরটা যেমন সুন্দর করে সাজানো, বাইরের পরিবেশও তেমনই আকর্ষণীয়। সাজসজ্জায় গ্রামবাংলার ছোঁয়া, আদিবাসী সংস্কৃতির নানা উপাদান। যাঁরা একটু অন্যরকম পরিবেশে খেতে ভালবাসেন, তাঁদের কাছে জায়গাটি বেশ উপভোগ্য। এমনকী এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে যায় কর্মীদের পোশাকও। ধুতি আর গেঞ্জি পরে খাবার পরিবেশন করেন তাঁরা। সব মিলিয়ে একটা নিজস্ব আবহ তৈরি হয়েছে। কাঁসার থালা, কাঁসার বাটি, কাঁসার গ্লাস— মনে করিয়ে দেয় গ্রাম বাংলার ফেলে আসা পরম্পরাকে।

তবে শুধু পরিবেশ দিয়ে নয়, খাবারের বৈচিত্র্য দিয়েও নজর কাড়ে ধামসা। মেনুতে রয়েছে বেশ কিছু অভিনব পদ। শুঁটকি মাছ থেকে শুরু করে বাঁশপোড়া চিকেন, মাটন— চেনা খাবারের বাইরে অন্য স্বাদের খোঁজ মেলে এখানে। গন্ধরাজ লেবু বা আমপোড়ার সরবত নিয়ে আপনাকে স্বাগত জানানো হবে। স্টার্টারে রয়েছে নানা বিচিত্র সব আইটেম, যা আর দশটা রেস্তোরাঁয় পাবেন না। রয়েছে নানা ধরনের থালি। পান্তা ভাত যেমন আছে, তেমনই আছে বরিশাল থালি। ফলে একসঙ্গে বেশ কয়েক রকম পদ চেখে দেখার সুযোগও রয়েছে।

খাওয়াদাওয়ার শেষ পাতে চমক আরও একবার। কালো চালের পায়েস, চাটনি, পাপড়—সব মিলিয়ে জমজমাট আয়োজন। বিশেষ করে কালো চালের পায়েসের মতো পদ খাবারের



অভিজ্ঞতায় আলাদা মাত্রা যোগ করে। এতসব আয়োজনের পরেও দাম সাধ্যের মধ্যে। অর্থাৎ শুধু অভিনব পরিবেশের জন্য নয়, পকেটের কথা ভেবেও এখানে আসা যায়।

আসলে, কলকাতার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আরও একটা কলকাতা। যেখানে শহুরে ব্যস্ততার বদলে পাওয়া যায় গ্রামজীবনের আমেজ, লোকসংস্কৃতির ছোঁয়া আর একটু অন্যরকম স্বাদের অভিজ্ঞতা। শীতের দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় ধামসার এই পরিবেশ যেন আরও মায়াবী হয়ে ওঠে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা হোক, পরিবারের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া কিংবা নিছকই নতুন কিছু অভিজ্ঞতা—ধামসা হতে পারে বেশ ভাল একটা গন্তব্য। শহরের মধ্যে থেকেও কয়েক ঘণ্টার জন্য শহরকে ভুলে যেতে চাইলে, একবার ঘুরে আসতেই পারেন ধামসায়।



বিগ বস! যিনি পারেন, তিনি পারেন

ধীমান সাহা

একই অঙ্গে নানা রূপ। তাঁকে একেকজন চেনেন একেকভাবে। ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে তিনি প্রাক্তন জাতীয় অধিনায়ক। যাঁরা হালফিলের আইপিএলের খবর রাখেন, তাঁদের কাছে তিনি দিল্লিক্যাপিটালসের কোচ। সিএবির আঙিনায় তিনি সিএবি সভাপতি। যাঁদের সন্ধেটা টিভির সামনে কাটে, তাঁদের কাছে তিনি দাদাগিরির সঞ্চালক। কারও কাছে তিনি দারুণ মোটিভেটর। কর্পোরেট দুনিয়ার কাছে তিনি সর্ষের তেল থেকে ধূপকাঠির বিপণন দূত। রাজনীতির আঙিনাতেও তাঁর নানা পরিচিতি। বছর পাঁচেক আগে জোর প্রচার ছিল, তিনি বিজেপির মুখ হতে চলেছেন। একবার মমতার সঙ্গে স্পেন যেতেই হয়ে গেলেন ট্রোলিংয়ের মোক্ষম এক শিকার।



তবু তিনি সৌরভ গাঙ্গুলি। বাঙালির আইকন। তাঁর কারখানা দিনের আলো দেখুক বা না দেখুক, বাঙালি তাঁকে মনে রাখবে ক্রিকেটের আইকন হিসেবেই। এবার তিনি অন্য এক ভূমিকায়। দাদাগিরির মঞ্চ ছেড়ে তিনি এখন বিগ বসের সেটে। সপ্তাহভার নানা কূটকচালির পর রবিবার তিনি এসে যেন এনে দিচ্ছেন অন্য এক আবহ। সৌরভের জীবনে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া অবশ্য নতুন কিছু নয়। তিনি যখন যে কাজে হাত দেন, সেটাকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি যদি চিংড়ি মাছের ব্যবসায় নামে, কয়েক মাসের মধ্যে অন্যতম সেরা চিংড়ি মার্চেন্ট হয়ে উঠতে পারেন। টেলিভিশনের পর্দায় প্রায় তিনি কতটা সফল, দেড় দশক ধরে দাদাগিরি জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। দাদাগিরি শুধু একটি কুইজ অনুষ্ঠান হয়ে থাকেনি। সৌরভের উপস্থিতি, প্রতিযোগীদের সঙ্গে তাঁর সহজ কথাবার্তা, রসিকতা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার ধরন অনুষ্ঠানটিকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছিল। সেখানে প্রতিযোগীদের সঙ্গে দর্শকেরও একটা আত্মিক যোগাযোগ তৈরি হত। যেমনভাবে অজয় বসুর কণ্ঠস্বর ক্রিকেট বা ফুটবলকে বাঙালির ড্রয়িংরুমে পৌঁছে দিয়েছিল, তেমনই সৌরভের সঞ্চালনা দাদাগিরিকে অন্য এক মাত্রা দিয়েছিল।

কিন্তু বিগ বস একেবারেই অন্য ঘরানার অনুষ্ঠান। এখানে জ্ঞান বা প্রতিভার পরীক্ষা নেই। বরং এক ছাদের নীচে একদল মানুষকে রেখে তৈরি করা হয় নানা পরিস্থিতি। কখনও বন্ধুত্ব, কখনও শত্রুতা, কখনও জোট ভাঙা, কখনও ব্যক্তিগত আক্রমণ। কূটকচালি, ঝগড়াঝাঁটি, অভিমান, অভিযোগ—সব মিলিয়ে এক



অদ্ভুত বিনোদনের প্যাকেজ। অনেকের কাছে যা বেশ উপভোগ্য, আবার অনেকের কাছেই যথেষ্ট বিরক্তিকর।

এমন একটি অনুষ্ঠানে সৌরভকে নিয়ে আসার মধ্যে চ্যানেলের কৌশলটা বেশ পরিষ্কার। বিগ বসের পরিচিত ফরম্যাটের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বাংলার আইকনকে। দীর্ঘ দশ বছর পর বাংলায় বিগ বসের প্রত্যাবর্তন। ফলে শুধু অনুষ্ঠান নয়, সঞ্চালক হিসেবেও সৌরভকে নিয়ে দর্শকদের কৌতূহল ছিল যথেষ্ট। তাঁর ক্রিকেটীয় ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা, কথাবার্তার মধ্যে একটা স্বাভাবিক কর্তৃত্ব—এসব বিগ বসের মঞ্চে কতটা কাজে লাগে, সেটাই ছিল দেখার।

সৌরভের একটা বড় সুবিধে হল, ক্যামেরার সামনে তিনি স্বচ্ছন্দ। দাদাগিরিতে সেটা বহুবার প্রমাণিত। প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর মধ্যে একটা সহজাত রসিকতা থাকে। কখনও মজা করেন, কখনও একটু খোঁচা দেন, কখনও নিজের জীবনের গল্প শোনান। বিগ বসেও সেই পরিচিত সৌরভকে দেখা যায়। তাঁর উপস্থিতি অনুষ্ঠানের প্রতি প্রাথমিক আগ্রহ বাড়িয়েছে, সন্দেহ নেই।

তবে প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। দাদাগিরি আর বিগ বসের দর্শকের মানসিকতা এক নয়। দাদাগিরিতে সৌরভ নিজেই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। কিন্তু বিগ বসের মূল আকর্ষণ প্রতিযোগীরা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রতিদিনের নাটকীয়তা। সঞ্চালকের কাজ সেখানে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত। সপ্তাহান্তে এসে প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথা বলা, ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া, কখনও প্রশংসা, কখনও সমালোচনা।

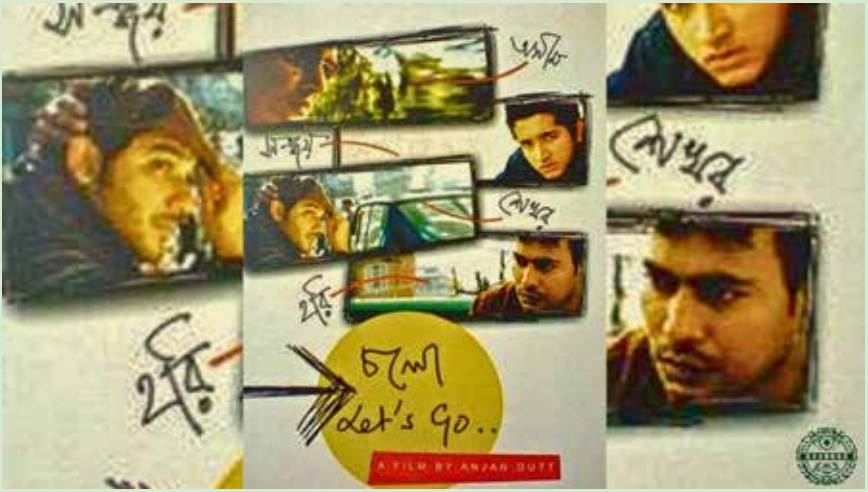


বা অনুষ্ঠানের আকর্ষণ কিছুটা বাড়ানো। কেউ কেউ বলতে পারেন, সারা সপ্তাহের ফাঁক ফোকর তাঁর উপস্থিতি দিয়ে কিছুটা মেরামত করা।

আর এখানেই কিছুটা সমস্যা। সৌরভকে যাঁরা দাদাগিরির মেজাজে দেখতে অভ্যস্ত, তাঁরা বিগ বসে হয়তো সেই পরিচিত উচ্ছ্বাস বা সাবলীলতা সব সময় খুঁজে পান না। সৌরভ অনুগামীদের মনে হতেই পারে, এমন একটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সৌরভ নিজেকে খামোখা জড়াতে গেলেন কেন? নিশ্চিতভাবেই বড় অঙ্কের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সৌরভের মতো চরিত্র কি শুধু টাকার অঙ্ক দেখে এমন একটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে রাজি হবেন? নিশ্চিয় তিনি এমন কিছু চ্যালেঞ্জ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে, এই অনুষ্ঠানও তাঁর জীবনে একটা মাইলস্টোন হয়ে উঠতে পারে।

তবু একটা কথা মানতেই হবে, সৌরভের মতো একজন ব্যক্তিত্বকে বিগ বসের মঞ্চে পাওয়া বাংলা টেলিভিশনের পক্ষে বড় ঘটনা। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে যাঁদের একেবারেই আগ্রহ ছিল না, তাঁদেরও অনেকেই রবিবার টিভি খুলে বসছেন শুধুমাত্র সৌরভের আকর্ষণে। বিশ্বাস, সৌরভ যখন আছেন, নিশ্চয় কিছু প্ল্যানিং আছে। কিন্তু সেই কৌতূহলী দর্শককে নিয়মিত দর্শকে পরিণত করা বড় একটা চ্যালেঞ্জ। আসলে সৌরভের জনপ্রিয়তা আর বিগ বসের জনপ্রিয়তা এক জিনিস নয়। একজনের প্রতি আবেগ থাকলেই তাঁর করা প্রতিটি অনুষ্ঠান দর্শকের ভাল লাগবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। সৌরভের ক্ষেত্রেও সেটাই প্রযোজ্য।

ক্রিকেট মাঠে অধিনায়ক হিসেবে তিনি দলকে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বের করে এনেছেন। গ্রেগ চ্যাপেলের কোপে পড়ে বাদ গিয়েও দারুণভাবে ফিরে এসেছেন। সেই কামব্যাকও বাঙালির জীবনে বড় এক প্রেরণা। দাদাগিরিতে নিজের একটা স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করেছেন। চেনা মঞ্চের কমফোর্ট জোন ছেড়ে বিগ বসে তাঁকে নতুন করে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। এমন কঠিন চ্যালেঞ্জ তিনিই নিতে পারেন।



ট্যুর অপরারেটর হওয়ার ভূত মাথা থেকে নেমে গেল

সৌরদীপ সরকার

একটি ছবি ও তাকে ঘিরে নিজেদের ভাবনা বদল। এমনটাই আজ লিখতে ইচ্ছে করছে। খুব ইচ্ছে ছিল, কয়েকজন বন্ধু মিলে পর্যটন ব্যবসা করব। আমরা চারজনই ঘুরতে ভালবাসি। কিন্তু কিছু একটা কাজ তো করতে হবে। সহজ কথা, ঘুরতে গেলে উপার্জন তো দরকার। যদি চাকরি করি, ছুটি পাওয়া মুশকিল। যদি ছুটি পাইও, সবাই একসঙ্গে পাব না। তাছাড়া, সারা বছর যদি পাঁচ-ছটা জায়গাও যেতে হয়, তার তো অনেক খরচ।

তাহলে কী করা যায়? পার্থই প্রথম বুদ্ধিটা দিল। আমরা যদি ট্যুর ব্যবসা করি, তাহলে কেমন হয়। ওটাই কাজ, ওটাই উপার্জন। আবার লোকের টাকায় বেড়ানোও হয়ে গেল। আলাদা করে ছুটির দরকার নেই।

ভেবে দেখলাম, আইডিয়াটা মন্দ নয়। এমনিতেই ঘুরতে ভাসলবাসি। অনেক জায়গায় গেছি। আরও অনেক জায়গায় যেতে চাই। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে টুকটাক



পরিচিতিও তৈরি হয়েছে। হোটেল বা গাড়ি পেতে সমস্যা হবে না। আমরা দারুণ দারুণ জায়গায় লোককে ঘোরাব। তারা ফিরে এসে প্রশংসা করবে, ফেসবুকে ছবি দেবে, আমাদের কথা লিখবে। সেই দেখে আরও লোক পিলপিল করে আসবে। সবাই চাইবে অল্প খরচে ব্যতিক্রমী জায়গায় যেতে।

কয়েকদিন এই ভাবনার মধ্যেই কেটে গেল। একজন পরামর্শ দিল, একটা ছবি দেখতে। তাহলে কিছুটা আইডিয়া পাওয়া যাবে। কোন ছবি? অঞ্জন দত্তর 'চলো লেটস গো।' সেখানে শাশ্বত আছে, পরমব্রত আছে, রুদ্রনীল আছে। অরিন্দম, সুজন, ঋত্বিক, কৌশিক, চুর্নী থেকে শুরু করে আরও অনেকেই আছে। বেড়ানো নিয়েই ছবিটা। ডুয়ার্সের ক্যানভাস ক্যামেরায় দারুণ ধরা পড়েছে। কিন্তু ট্যুর অপারেট করতে যে এত ঝামেলা পোহাতে হয়, তা কে জানত! কারও পছন্দমতো রুম চাই, বাসে পছন্দমতো আসন চাই। কারও গিজার চলছে না, তো কারও বিছানার চাদর নোঙরা। কেউ চায়, বাসে গান চলুক, কেউ চায় নীরবে যেতে। কেউ চায় একটা জায়গা ভাল করে ঘুরে দেখতে, অন্যজন চায় একসঙ্গে অনেকগুলো জায়গা ছুঁয়ে যেতে। এমন গণতন্ত্র থাকলে আর দেখতে হচ্ছে না। ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। টুকরো টুকরো কতরকমের ঝামেলা।

ওই সিনেমাতেও দেখেছিলাম, শেষপর্যন্ত ওই বন্ধুরাও আর ট্যুর ব্যবসা করেনি। যে যার নিজের নিজের ধান্দা খুঁজে নিয়েছিল। একটা ট্যুরেই ওরা বুঝে নিয়েছিল, এত ঝক্কি-ঝামেলা নেওয়া ওদের কম্ম নয়। আমরাও ওই একটা ছবি দেখেই বুঝলাম, নিজেরা বেড়াতে যাব, সেটাই ভাল। ট্যুর অপারেটর হওয়া আমাদের কম্ম নয়।

বলতে পারেন, ওই একটা ছবিই আমাদের চোখ খুলে দিয়ে গেল। থ্যাঙ্ক ইউ অঞ্জন দত্ত। ওই ছবিটা না দেখলে আমরাও হয়ত প্রবল উৎসাহে নেমে পড়তাম। হাবুডুবু খেতাম। একটা ছবিই কত কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেল।

(কোনও ছবি কি আপনার জীবন বদলে দিয়েছে? এমন অভিজ্ঞতা থাকলে আপনিও লিখুন। ছবির কথা, আপনার অনুভূতির কথা।)

bengaltimes.in@gmail.com



ব্যর্থতার এমন উদযাপন!

রক্তিম মিত্র

আরও একটি এনকাউন্টার। সংখ্যাটা পাঁচে এসে দাঁড়াল। আহা, কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। যেন এটা সরকারের বিরাট একটা সাফল্য। কী সুদর, আমরা উত্তর প্রদেশের পথে হেঁটে চলেছি।

আচ্ছা, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুলিশের কাজ কী? অপরাধ হলে, তদন্ত করা। প্রমাণ জোগাড় করা। কোর্টে তুলে ধরা। সেই তথপ্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধের চরিত্র অনুযায়ী আদালত বিচার করবে। আইন এবং সংবিধানকে রক্ষা করার শপথ নিয়েই একটা সরকার পথ চলে।

কিন্তু সরকারের প্রধান হুঙ্কার দিয়ে চলেছেন, ‘সকালে জমা, বিকেলে খরচ।’ কী আশ্চর্য, তিনি বলার পর একে একে মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করাও এই জাতীয় সংলাপ আউড়ে চলেন। এইসব



অর্বাচীনরা সংবিধানের শপথ নিয়েছেন। আসলে, কী শপথ নিয়েছেন, তার মানে কী, এটুকু বুঝতে যে বিদ্যেবুদ্ধিটুকু লাগে, তাও এই অর্বাচীনদের নেই।

প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই এক চিত্রনাট্য। পুলিশ নাকি অভিযুক্তকে ধরে পুনর্নির্মাণ করতে নিয়ে গিয়েছিল। অভিযুক্ত নাকি পুলিশের রিভলভার কেড়ে নিয়ে পুলিশকে গুলি করতে চেয়েছিল। সেই কারণেই পুলিশ গুলি চালিয়েছে। বারবার এত ছেঁদো চিত্রনাট্য, ভাবনার দৈন্যতা দেখেও করুণা হয়।

ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে গেলে, সবসময় রাতেই কেন যেতে হচ্ছে? হাত বাঁধা থাকছে না কেন? কোথাও কোনও ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছে না কেন? এসব প্রশ্ন তুলতে গেলেই হয় বলা হবে দেশদ্রোহী, নইলে বলা হবে পাকিস্তানে চলে যাও। যেমন মূর্খ প্রশাসক, তাদের তেমন মূর্খ বাহিনী।

নিয়ম অনুযায়ী, এনকাউন্টার হলে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত হওয়ার কথা। কিন্তু সেই তদন্তের নামে কী প্রহসন হবে, তা জানা কথা। পুলিশ একরকম বয়ান দিচ্ছে। পুলিশ বলছে আত্মরক্ষার্থে বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হয়েছে। কিন্তু মূর্খ ভক্তদের আইন বাঁচিয়ে কথা বলার দায় নেই। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন। এনকাউন্টারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতিত্ব দিয়ে বসছেন। এটাকে নিজেদের সাফল্য বলে প্রচার করছেন। এনকাউন্টার মানে পুলিশের ব্যর্থতা। কী আশ্চর্য, সেই ব্যর্থতার জন্যও উল্লাস চলছে। ব্যর্থতার এমন উদযাপন আকাট মূর্খরাই করতে পারে।



অর্থাৎ, ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তে প্রশাসন যে ব্যাখ্যাই দিয়ে থাকুক, ধামাচাপা দিতে ম্যাজিস্ট্রেট যাই করে থাকুন, আসল ঘটনা কী, এই ভক্তকূলের উল্লাসেই বোঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ, প্রশাসন আইন বাঁচাতে বলবে, আমরা করতে বাধ্য হয়েছি। আর এই ভক্তকূল বলবে, বেশ হয়েছে।

ধরেই নিলাম, প্রতিবার অভিযুক্তরা বন্দুক ছাড়িয়ে নিচ্ছে। তাহলে, কেমন পুলিশ আমাদের ট্যাক্সের টাকায় পোষা হচ্ছে, সেটাই ভাবুন। আগে পুলিশ হয়তো টেবিলের তলায় লুকিয়েছে। কিন্তু কথায় কথায় এভাবে তাঁর রিভলভার কেড়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেনি। তাহলে, কোন পুলিশ বেশি অপদার্থ? কোন পুলিশ মন্ত্রী বেশি ব্যর্থ?

পুলিশের মূল কাজ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা। তার বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড় করা। প্রমাণ সংগ্রহ করা। আদালতের কাছে প্রমাণ তুলে ধরা। বোঝাই যাচ্ছে, পুলিশ এই কাজটা পারবে না, এটা মুখ্যমন্ত্রী কার্যত মেনেই নিচ্ছেন। আচ্ছা, এই এনকাউন্টার মানে তো আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিও অনাস্থা জানানো। মানুষের আস্থা কমতেই পারে। তাই বলে আদালতের ওপর সরকারেরও আস্থা থাকবে না?

কোনও এক বিকৃতকাম মানুষ কোনও মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। আর এখানে নির্বাচিত সরকার আইনি প্রক্রিয়াকে ধর্ষণ করছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতাকে প্রতিনিয়ত ধর্ষণ করছে। এবং সেই ধর্ষণেই উল্লাস করছে। আসল রাষ্ট্রদ্রোহী তাহলে কারা?



দায় নেওয়ার বান্দা গম্ভীর নন

নির্মল দত্ত

ধোনির সময়ে একটা রেওয়াজ ছিল। দল জিতলে তিনি আসবেন না। পাঠিয়ে দেবেন ম্যাচের নায়ককে। কারণ, সেদিন সবাই নায়কের কথাই শুনতে চায়। তাছাড়া, সাফল্যের দিনে অধিনায়কের আড়াল রাখাটাও জরুরি। কিন্তু দল যদি হারে! কে দায় নেবে? সেদিন কিন্তু অন্য কাউকে পাঠাতেন না। সব অপ্রিয় প্রশ্নের জবাব দিতে নিজেই চলে আসতেন। অন্যদের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াতেন। সম্ভবত, এই কারণেই মহেন্দ্র সিং ধোনিকে অন্যতম সেরা অধিনায়ক বলা হয়।

মনে হতে পারে, গৌতম গম্ভীরও হয়তো তেমনই একজন মানুষ। দিল জিতলে বোলিং কোচ, ফিল্ডিং কোচ— যাঁকে হোক পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু দল যেদিন শোচনীয়ভাবে হারল, সেদিন নিজে চলে

এলেন। কিন্তু এসে কী বললেন? বুঝিয়ে



দিলেন, দলের ব্যাটিং ব্যর্থতায় তিনি বেশ চিন্তিত। সামনেই বিশ্বকাপ। তার আগে এমন শোচনীয় ব্যাটিং! তিনি বেশ উদ্বিগ্ন।

আসলে, এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইলেন কোচ সাহেব। শুধু যে ভারত শোচনীয়ভাবে হেরেছে, তা তো নয়। দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার ব্যাটে রান নেই। ভারতীয় দলে এই দুজনের উপস্থিতি যে কোচ গম্ভীরের না-পসন্দ, এটা কে না জানে। কিছুটা তেঁতো বড়ি গেলার মতো করেই গিলতে হচ্ছে। এর ওপর বিরাট-রোহিত যদি ব্যাট হাতে রান করে দেন, তাহলে গম্ভীরবাবু আরও গম্ভীরতর হয়ে পড়েন। পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে বিরাট মাত্র একটিতে রান পেয়েছেন। রোহিত সব ম্যাচেই ব্যর্থ। এই ঘটনায় সবথেকে বেশি যিনি আনন্দ পেতে পারেন, তাঁর নাম অবশ্যই গৌতম গম্ভীর। তিনি পড়েছেন উভয় সঙ্কটে। একদিকে দলের জয় চাই। নইলে, তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে। অন্যদিকে, বিরাট-রোহিতদের ব্যাটে যদি রান চলে আসে, তাও মুশকিল। তখন তাঁর মুখে ঝামা ঘসেই এই দুজন বিশ্বকাপে খেলবেন। অর্থাৎ, একদিকে দলের জয় চাই। অন্যদিকে তিনি যেন বোঝাতে পারেন, এই দুজনের অবদান ছাড়াও জেতা যায়। এই সিরিজে তাঁর দুটো প্রাপ্তিযোগই হয়েছে।

তাই, চতুর্থ ম্যাচে শোচনীয় হারের পর তিনি দায় নিতে এলেন, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। তিনি এটাই বোঝাতে এলেন, এই দুই মহাতারকাকে নিয়ে এত আদিখ্যেতার কিছু নেই। তাঁরা আর অপরিহার্য নন। তাঁদের উপস্থিতি দলের শক্তি বাড়াচ্ছে না, বরং দুটো জায়গা দখল হয়ে আছে। এই কথাগুলো বললেন না ঠিকই, কিন্তু না বলা কথার বঙ্গানুবাদ করলে যা দাঁড়ায়, তা অনেকটা এরকমই।



গ্যালারির রং সেই হলুদই থাকবে

মুকুল নন্দী

চেন্নাইয়ের সাত নম্বর জার্সিতে আর হয়তো ব্যাট হাতে মাঠে নামতে দেখা যাবে না। যে মাঠেই তিনি, সেই মাঠেই গ্যালারির একটা বড় অংশের রং হয়ে যেত হলুদ। প্রতিপক্ষের মাঠেও। কখনও কলকাতা, কখনও মুম্বই, কখনও বেঙ্গালুরু—ধোনি নামলেই গ্যালারিতে দেখা যেত হলুদ সমুদ্র। মহেন্দ্র সিং ধোনি শুধু চেন্নাই সুপার কিংসের ছিলেন না। দলীয় পরিচয়, শহরের সীমানা, সমর্থনের বিভাজন পেরিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আসমুদ্র হিমাচলের।

আইপিএলের ইতিহাসে এমন জনপ্রিয় ক্রিকেটার খুব বেশি আসেননি। চেন্নাইয়ের



সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা শুধু অধিনায়ক আর দলের ছিল না। ছিল আবেগের, বিশ্বাসের, ভালোবাসার। চেন্নাইয়ের মানুষ তাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন। আর ধোনিও যেন নিজের দ্বিতীয় ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিলেন এই শহরে। তাই তো তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে ‘থালা’। শুধু একজন ক্রিকেটার নন, তিনি চেন্নাইয়ের আবেগ।

কয়েক বছর ধরেই তাঁকে ঘিরে চলছিল অবসরের জল্পনা। প্রতি মরশুমের আগে একই প্রশ্ন—এটাই কি শেষবার? প্রতিটি আইপিএল যেন হয়ে উঠত ধোনিকে দেখার শেষ সুযোগ। বয়স বাড়ছিল, শরীরের সঙ্গে লড়াই বাড়ছিল। ব্যাটিং অর্ডারে নিজেকে ক্রমশ নামিয়ে আনছিলেন আট নম্বরে, কখনও নয়ে। খুব বেশি বল খেলার সুযোগও মিলত না। তবু যখনই ব্যাট হাতে নামতেন, গ্যালারিতে উত্তেজনার পারদ চড়ত। একটা ছক্কা, একটা হেলিকপ্টার শট, একটা পরিচিত ফিনিশ—এতেই মনে হত, মাঠে আসা বা টিভির সামনে বসা সার্থক।

এবার সেই অধ্যায়ের ইতি। ব্যাট তুলে রাখার সিদ্ধান্ত। ক্রিকেটার ধোনির হয়তো এটাই শেষ বিদায়। কিন্তু ধোনি কি এত সহজে বিদায় নিতে পারেন? যাঁর উপস্থিতিই একটা দলের আত্মবিশ্বাস, যাঁর পরামর্শে বদলে



যেতে পারে ম্যাচের গতিপথ, যাঁর নীরবতাও ড্রেসিংরুমে অনেক কথা বলে দেয়, তিনি কি আর পাঁচজনের মতো অবসরে চলে যাবেন?

এবার অন্য ভূমিকায়। মেন্টর হিসেবে, পরামর্শদাতা হিসেবে। ব্যাট হাতে ক্রিজে নামবেন না, কিন্তু ডাগআউটে তো থাকবেন। মাঠের বাইরে থেকে দলকে পথ দেখাবেন। তরুণ ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়াবেন। চেন্নাইয়ের মুখ হয়ে থাকবেন তিনিই।

শেষ ওভারে ম্যাচ আটকে গেলেও যাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হত, এখনও কিছু একটা হতে পারে। ক্রিকেটের অনিশ্চয়তার মধ্যে যিনি বারবার আশ্বাস হয়ে উঠেছেন।

তাই সাত নম্বর জার্সি হয়তো আর ব্যাট হাতে মাঠে নামবে না। কিন্তু গ্যালারির হলুদ রং ফিকে হবে না। চেন্নাইয়ের গ্যালারিতে ধোনির নাম উঠলে সেই চেনা গর্জন শোনা যাবে। প্রতিপক্ষের মাঠেও হলুদ জার্সি পরে হাজির হবেন তাঁর অনুরাগীরা।

ক্রিকেটার ধোনির একটা অধ্যায় শেষ হতে পারে। কিন্তু ধোনি নামের আবেগের কি কোনও অবসর হয়? ব্যাট হাতে না হোক, ডাগআউটে থাকুন থালা। চেন্নাইয়ের গল্পে তাঁর থাকা এখনও বাকি।



ভূতের খোঁজে নৈশ অভিযান শিমূলতলায়

উঠল বাই, শিমূলতলা যাই। হঠাৎই চলে যাওয়া। তাও প্রায় আঠারো বছর আগে। সারাদিন টেনে ঘুম, রাতে হ্যাজাক নিয়ে বেরিয়ে পড়া। এমনই নৈশ অভিযানের স্মৃতি উঠে এল সৌম্যদীপ সরকারের লেখায়।

তখন হালকা শীতের আবহ। তখনও মোবাইল নামক বস্তুটি এতটা গণহারে ছড়িয়ে যায়নি। স্মার্টফোন, জিও-ডেটা এসব শব্দগুলি তখনও আম বাঙালি শোনেনি। 'অনুপ্রেরণা' নামক শব্দটি ডিকশেনারিতে থাকলেও যত্রতত্র তার ব্যবহার ছিল না। কারও কারও মোবাইল থাকলেও ফোন এলেই

ইনকামিংয়ের জন্য মিনিট পিছু তিন টাকা গচ্চা যেত।

তেমনই একটা সময়ে হঠাৎ করে শিমূলতলা অভিযান। কোনও আগাম পরিকল্পনাই ছিল না। গুগল নামক সিধু জেঠুর কাছে রুট জানার উপায়ও ছিল না। সেই উঠল বাই, শিমূলতলা যাই। আসলে, সেবার গিয়েছিলাম ডিসেরগড়ে, ছিন্নমস্তা মেলায়। সেখান থেকেই 'ভূত' নিয়ে নানা আলোচনা। তখনই একজন বলল, শিমূলতলায় ভূত দেখতে গেলে কেমন হয়! ধ্বনি ভোটে প্রস্তাব পাস। আমি তখন কলেজের ছাত্র। বয়সে সর্ব-কনিষ্ঠ। আমার আপত্তি ধোপে টিকল না। আমার অবশ্য শিমূলতলা নিয়ে আপত্তি ছিল না। বলেছিলাম, ভূত বলে বস্তুই যখন নেই, তখন তা দেখতে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। বেড়াতে যাচ্ছি বললে আপত্তি নেই, কিন্তু ভূতকে টেনে আনা কেন? সংখ্যাগরিষ্টের রায়ে আমার যুক্তি ধোপে টিকল না।

ঠিক হল, শিমূলতলাই যাওয়া হবে, এবং ভূত দেখাটাই মূল এজেন্ডা। সভা থেকে ওয়াক আউট নয়। বরং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সেই তত্ত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়কে শিরোধার্য করেই পাড়ি দিলাম। কোন ট্রেনে গিয়েছিলাম, কোথায় গিয়ে নেমেছিলাম, এতদিন পর আর মনে নেই। শুধু মনে আছে, ভোরেই ট্রেনে উঠেছিলাম। বোধ হয় ঘণ্টা তিনেক লেগেছিল। অনলাইন বুকিং নামক শব্দটা তখনও আমরা শুনিনি। নেমে শুনলাম, হোটেল-ফোটেল তেমন কিছু নেই। কারও বাড়িতেই থাকতে হবে। একটা ঠ্যালা ভ্যান জুটল। সে-ই একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। আসার পথেই দেখছিলাম, একের পর এক বাড়ি। বাইরে তালা ঝোলানো। দরজায় শ্যাওলা জমে। কোনও অনুপ্রেরণা ছাড়াই নিজের নিয়মে লতা পাতা গজিয়ে গেছে। কেউ থাকে বলে মনে হয় না। সাম্প্রতিককালে কেউ এসেছে বলেও মনে হয় না। তাহলে এগুলো কাদের বাড়ি? কারা বানিয়েছেন? কেনই বা বানিয়েছেন? নানা প্রশ্ন তখন উকি দিচ্ছে। কিন্তু কাকেই বা প্রশ্ন করব? কেউ তো নেই। অগত্যা, নিজেরাই প্রশ্ন করছি। নিজেরাই মনে মনে উত্তর সাজাচ্ছি। বাঙালি একসময় পশ্চিমে যেত। বাঙালির পশ্চিম বলতে এইসব জায়গাগুলোই বোঝাতো। কয়েক দিনের হাওয়া বদল। গল্পে-সিনেমায় পড়েছি, দেখেছি।

আমাদেরও ঠাঁই হল তেমনই এক বাড়িতে। কেয়ার টেকারের দেখা পেলাম। উঠোনের ভেতর কুয়ো। দড়ি, বালতি আছে। নিজেদেরই তুলে নিতে



হবে। মনে পড়ে গেল অরণ্যের দিনরাত্রির কথা। পালামৌ এর জঙ্গলে এমন কুয়োতেই তো স্নান করতে দেখা গেছে সৌমিত্র, শুভেন্দু, রবি ঘোষ, সমিত ভঞ্জদের। আমরাও না হয় সেভাবেই করব। কিন্তু খাওয়ার জায়গা কোথায়? কেয়ারটেকার একটা হোটেলের সন্ধান দিলেন। অর্ডার দিয়ে রাখলে রান্না করে রাখে। ঠিক হল, আগামী দুদিন আমরা সেখানেই অন্নগ্রহণ করে কৃতার্থ করব।

সবাই রাত ভোরে উঠেছে। ভোরে ওঠার অভ্যেস আছে, এমন দুর্নাম কাউকেই দেওয়া যাবে না (এমনকি আমাকেও না)। যখন তোমার ঘুম ভাঙবে, তখন তোমার সকাল— এই ঐতিহাসিক গানটা তখনও লেখা হয়নি। কিন্তু আমাদের সকাল আমাদের মতো করেই হত। শিমূলতলায় পৌঁছেই সবার যেন একটাই ডেস্টি-নেশন — ঘুম। কোনও রকমে দুপুরে সেই হোটেলে খেয়ে আসা হল। ফিরে এসে আবার ঘুম। বিকেল হল, সন্ধে হল। উঠলেও বেরোনোর নাম নেই। বেড়াতে এসেছি। ঘরে বসেই কাটিয়ে দেব? এসব বলেও কোনও লাভ হল না। কেউ পাত্তাই দিল না। ওদের দাবি, তুই বেড়াতে এসেছিস, বেড়িয়ে আয়। আমরা এসেছি ভূত দেখতে, আমরা রাতে বেরোবো।

এ তো আজব পাবলিকদের পাল্লায় পড়া গেল। আমি তখন ভয়ঙ্করভাবে সংখ্যালঘু। ১:৫। অগত্যা, গণতন্ত্রের রায় শিরোধার্য। কুন্তলদা তখন নানারকম গল্প ফেঁদে চলেছে। কিছুটা সত্যি, কিছুটা জল মেশানো। কিন্তু

এমন নিপুন সেই বলার কায়দা, কোনটা দুধ, কোনটা জল, সেই ফারাক করা হাঁস তো দূরের কথা, স্বয়ং পরমহংসেরও অসাধ্য। সঙ্গ দিয়ে চলেছে জয়, কুণালরা। সানি বলে একজন গিয়েছিল। সে উঠতি ব্যান্ড গায়ক। তাই মাঝে মাঝেই গানের কথাও উঠে আসছিল। আমার খালি মনে হচ্ছিল, এরা বেড়াতে এসে ঘুমিয়ে আর ঘরে বসেই কাটিয়ে দেবে?

রাতে হোটেল তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই কেয়ারটেকার বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে আসতে। কিন্তু তখন চলছে নৈশ অভিযানের প্রস্তুতি। জোগাড় করা হল হ্যাজাক লাইট। কয়েকটা টর্চ তো সঙ্গেই ছিল। হ্যাজাক, টর্চ, লাঠি নিয়ে নৈশ অভিযান। হোটেলে খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়া। যেন ভূতেদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। তারা যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। রাস্তা শুনশান। টেলিফোন বুথ নেই, ইলেকট্রিকের তার কাটা। শোনা গেল, এদিকে মাওবাদীদের উপদ্রব। তারাই তার-ফার কেটে গেছে। এই অবস্থায় লাঠি, হ্যাজাক হাতে আমরা ছজন রাতের বেলায় ঘুরছি। এ যেন উভয় সংকট। মাওবাদীরা ভাবতে পারে, পুলিশের লোক। আর পুলিশ বা গ্রামবাসী ভাবতে পারে, ব্যাটারা নির্ঘাত উঠতি মাওবাদী। রাতে দেশি মুরগির ঝোল খাওয়ার পর গণপিটুনি জুটতেই পারে।

লোকালয় থেকে আরও ফাঁকার দিকে। একটার পর একটা পোড়ো বাড়ি। কতকাল রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। কতকাল এইসব বাড়িতে কারও পায়ের ছাপ পড়েনি। দরজায় লতা পাতা ঝুলছে। হাওয়ার শব্দ। দেওয়ালের সঙ্গে গাছের ডাল ঘসা যাচ্ছে। রোমাঞ্চ-কর এক পরিবেশ। ওদের কাছে সেটা যেন ভূতের পদধ্বনি। একটু একটু করে এগোলাম জঙ্গলের দিকে। মনে মনে বলছিলাম, সারাদিন শুয়ে বসে কাটালাম, রাতে কিনা বেরোলাম ভূত দেখতে! দূরে রাস্তায় লোক পেরোচ্ছে। তাকেই বেমালুম ভূত বলে চালিয়ে দেওয়া। আর এটা-ওটা আওয়াজ উঠলে তো কথাই নেই। সব ভূতের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দাও। এভাবেই রাত এগারোটা পেরিয়ে গেল। সব বিদ্রোহী যেন রণক্লান্ত। চলো মন নিজ নিকেতনে। সবাই সেই বাড়িতে ফিরে এলাম।

বিকেল আর সন্ধেটা ছিল কুন্তলদার। কিন্তু রাতে সানিকে যে নিজের প্রতিভা মেলে ধরতেই হবে। শুরু হল ব্যা-ন্ডের গান। গান না বলে গানের গুঁতো



বলাই ভাল। কী কথা, কী সুর, কোনও কিছুর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিনি। তবু বলে যেতে হল, দারুণ হচ্ছে। একেবারেই অন্য ঘরানার গান। আর দ্বিগুন উৎসাহ পেয়ে সানিও বিকট চিৎকার (ওর ভাষায় গান) করেই চলেছে। অগত্যাই রাতটা গড়িয়ে গেল ভোরের দিকে। ভোর রাতে ঘুম। কখন ভাঙবে, কে জানে!

পরদিন ঘুম ভাঙল বেশ বেলার দিকে। কী আর ব্রেকফাস্ট করব। এ তো লাঞ্চ টাইম। সেই হোটেল। ভাত দিয়েই ব্রেকফাস্ট। দুদিন হতে চলল। লাট্টু পাহাড়, রাজবাড়ি, ফলস কিছুই তো দেখা হল না। অগত্যা খাওয়ার পর একটা অটো রিজার্ভ করা হল। অটো –দাদাকে বলা হল, দু তিন ঘণ্টার মধ্যে যা যা ঘোরানোর ঘুরিয়ে দিতে। সে তো আপন মনে ইতিহাস বিকৃতি করে গেল। যে বাড়িটাই দেখছে, সেটাই নাকি বর্ধমান রাজার বাড়ি। রাজার কী দুর্দশা! পোড়ো বাড়িগুলোও তার নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই শিমূলতলায় নাকি দাদার কীর্তির শুটিং হয়েছে। কোন বাড়িতে? বুঝলাম, সে নিজেও জানে না। লাট্টু পাহাড়, ধারারা ফলস দেখা হল। পাথরের ওপর জল গড়িয়ে পড়ছে। এটাই নাকি ফলস। আর লাট্টু পাহাড়কে পাহাড় না বলে টিলা বলাই ভাল। সন্ধের আগেই ফিরে আসা। আবার একপ্রস্থ ঘুম। রাতে সেই



হোটেল। খাওয়া সেরে হ্যাজাক-টর্চ -লাঠি সহযোগে ফের ভূত-অভিযান। যথারীতি রাত এগারোটা পর্যন্ত 'ভূতের সন্ধানে'। ফিরে এসে সানির গান-গুঁতো।

পরদিন ফেরার পালা। তার আগে হোটেলের ধার মিটিয়ে আসতে হবে। বিল শুনে মাথায় হাত। দুদিন চারবেলা ছজনের খাওয়া। তার মানে ২৪ টা মিল। কত হতে পারে? দোকানি যে দর হাঁকল, পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁগুলিও লজ্জা পেয়ে যেত। আন্দাজে বিশাল দর হেঁকে ফেলেছে। কিন্তু কোনটার জন্য কত, বলতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলছে। শুনলাম, আমাদের জন্য নাকি সাতশো টাকার চাল লেগেছে। ষোল বছর আগের কথা। তখন চালের কেজি বড়জোর দশ টাকা। তার মানে, আমরা দুদিনে সত্তর কেজি চালের ভাত খেয়েছি! ডুয়ার্সের হাতিগুলোও বোধ হয় পরিসংখ্যান শুনলে লজ্জা পেত। সে যাই হোক, বোঝা গেল, মোট বিলে একটা শূন্য বেশি পড়ে গেছে। তাই দশগুণ হয়ে গেছে। সেসব খুচরো ঝামেলা মিটিয়ে আবার কু ঝিক ঝিক।

যাওয়ার সময় যেসব প্রশ্নগুলো ঘোরাফেরা করছিল, ফেরার সময় আবছা আবছা উত্তর পেয়েছি। কাদের বাড়ি, কারা আসত, এখন কেন বাড়িগুলোর এমন জীর্ণ দশা, উত্তরগুলো কিছুটা পরিষ্কার। কিন্তু বাকি পাঁচজনের এসব নিয়ে ভাবতে বয়েই গেছে। তাঁদের আক্ষেপ, ভূত দেখা হল না। আমার অবশ্য 'ভূত প্রীতি' বা 'ভূত ভীতি' তখনও ছিল না। আজও নেই। কিন্তু সেই নৈশ অভিযানের একটা রোমাঞ্চ তো আছেই। যা এতদিন পরেও মনকে ছুঁয়ে যায়।



অগত্যা সেই চিমনি

শুভেন্দু দেবনাথ

বেশ কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক ভাল লাগছিল না। তিনজনের টিম। দুদিনেই অনেকটা ঘোরা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, এবার অন্য কোথাও গেলে কেমন হয়। হাতে তখনও তিনদিন। কারণ, তিনদিন বাদে ফেরার টিকিট। এই তিনদিনে কোথাও একটা যাওয়াই যায়।

দুই বন্ধু একমত হলাম, কার্শিয়াংয়ের কাছে ডাউহিলে গেলে কেমন হয়! জায়গাটা দারুণ, কিন্তু থাকার জায়গার অভাব। একটা ফরেস্টের বাংলো আছে। কিন্তু বুকিংয়ের হাজার ঝামেলা। ডিএফও-কে ফ্যাক্স করতে হবে। তারপর কবে তার রিপ্লাই আসবে, কে জানে! উত্তর ইতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

হঠাৎ, চোখে পড়ল দার্জিলিং ডিএফও-র অফিস। সাহস করে ঢুকেই পড়লাম। নিজেদের ইচ্ছের কথা



জানালাম। উনি বললেন, এটা তো আমার কিছু করার নেই। ওটা কার্শিয়াং ডিএফও-র আন্ডারে পড়ছে।

তাঁকে বললাম, অতশত জানি না। আপনিই কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমরা চেষ্টা করলে হবে না, এটুকু জানি। আপনি চেষ্টা করলে হতেও পারে। একটু চেষ্টা করে দেখুন না।

উনি বললেন, কাল আসুন। আমি দেখে রাখব। যথারীতি পরের দিন গেলাম তাঁর দপ্তরে। বললেন, 'ওখানে এখন মেরামতি হচ্ছে। আপনারা বরং মিরিক চলে যান।' কেন জানি না, মন সায় দিল না। আগেও মিরিক গেছি। আলাদা করে দুদিন থাকার মানে হয় না।

অগত্যা সেইদিনই একটা গাড়ি ধরে নেমে গেলাম। ঠিক করলাম, কার্শিয়াংয়ে নামব। তারপর আশেপাশের কোথাও একটা জায়গা ঠিক খুঁজে নেব। গাড়িতেই একজনের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। আশেপাশে কোথাও রেয়ার স্পট আছে কিনা। তিনি বললেন চিমনির কথা। কাকে একটা ফোন করে নম্বরও জেনে নিলেন।

ফোন করা হল। যিনি ধরলেন, তিনি সটান জানিয়ে দিলেন রুম খালি নেই। কী আর করা যাবে! মন মরা হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ, মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি চেপে গেল। মনে হল, চিমনির সেই ভদ্রলোককে আবার ফোন করি। করলাম। শুরুতেই বললাম, দেখুন, আমি জানি আপনি বলবেন রুম নেই। আপনার 'না' শোনার জন্য ফোন করিনি। আমরা আসছি। আপনি ব্যবস্থা করন। এটা বলার জন্য ফোন করেছি।

উনি তো ঘাবড়ে গেলেন। আমতা আমতা করে হিন্দি -নেপালি মিশিয়ে বলতে চাইলেন, রুম নেই। আমরাও নাছোড়। বললাম, শুনুন ভাইয়া, এতদূর থেকে যখন এসেছি, তখন ফিরে যাব না। আমরা থাকব, ব্যাস। কোথায় রাখবেন, সেটা আপনার ব্যাপার। আমরা রান্নাঘরেও থাকতে পারি। ডাইনিংয়েও থাকতে পারি। আপনার ঘরেও থাকতে পারি। আপনি বরং এক-দু রাতের জন্য অন্য ঠিকানা খুঁজে নিন। কোনও বন্ধু বা আত্মীয়র বাড়িতে চলে যান।

এমন আজগুবি আবদার সে নিশ্চয় এই জন্মে শোনেনি। কার্শিয়াং থেকে একটা আলাদা গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম চিমনির দিকে। অনেকটাই ডাউহিলের রাস্তায়। ইচ্ছে ছিল একবার ডাউহিলে নামার। কিন্তু এমন বৃষ্টি, নামার সুযোগ হল না। গাড়ি চলল চিমনির দিকে। গিয়ে থামল সেই হোম স্টে-র সামনে।



চমৎকার হোম স্টে। পুরোটাই প্রায় ফাঁকা। মালিক বেরিয়ে এলেন। বললাম, এসে গেছি। এবার ব্যবস্থা করুন। উনি একটা সুন্দর ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললেন। বললাম, 'পুরোটাই তো ফাঁকা, তাহলে যে বললেন রুম নেই।' উনি কিছুটা লজ্জায় পড়ে গেলেন। বললেন, আসলে এক-দুটো রুমে লোক রেখে লাভ হয় না। সেই এক-দুজনের জন্য রান্না করতে হয়। একসঙ্গে অন্তত তিন-চারটে রুমে বুকিং থাকলে সুবিধা হয়। সেই কারণেই বলেছিলাম, রুম নেই।

তাঁর সমস্যাটা বুঝলাম। তিনি যে সত্যিটা বললেন, সেটা জেনে ভালও লাগল। আমরা আপাতত দুদিনের অতিথি। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা, সারাক্ষণ বৃষ্টি। বৃষ্টিটা দারুণভাবে উপভোগ করেছিলাম। প্রাণখুলে আড্ডা দিয়েছিলাম। কত গান গেয়েছিলাম। কত পুরানো স্মৃতি হাতড়েছিলাম। আর মাঝে মাঝেই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছি। এর তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিচ্ছি। দ্বিতীয় দিন একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আশপাশের এলাকাটা ঘুরে দেখলাম। রাস্তাটা তখন একেবারে এবড়ো খেবড়ো ছিল। শুনলাম, কয়েকদিন পরেই নাকি ঠিক হয়ে যাবে। জানি না, আজও ঠিক হয়েছে কিনা।

ওই দুর্গম পাহাড়ি পথেও ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। যাওয়াটা না হয় সহজ। নেমে গেলেই হয়। কিন্তু কার্শিয়াং থেকে হেঁটে ফিরে আসছে! সত্যিই পেন্নাম করতে ইচ্ছে হল। আমরা যদি এই দুর্গম এলাকায় থাকতাম, কোনকাল লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিতাম। ড্রপ আউটের তালিকায় আমাদের নামগুলো জ্বলজ্বল করত।

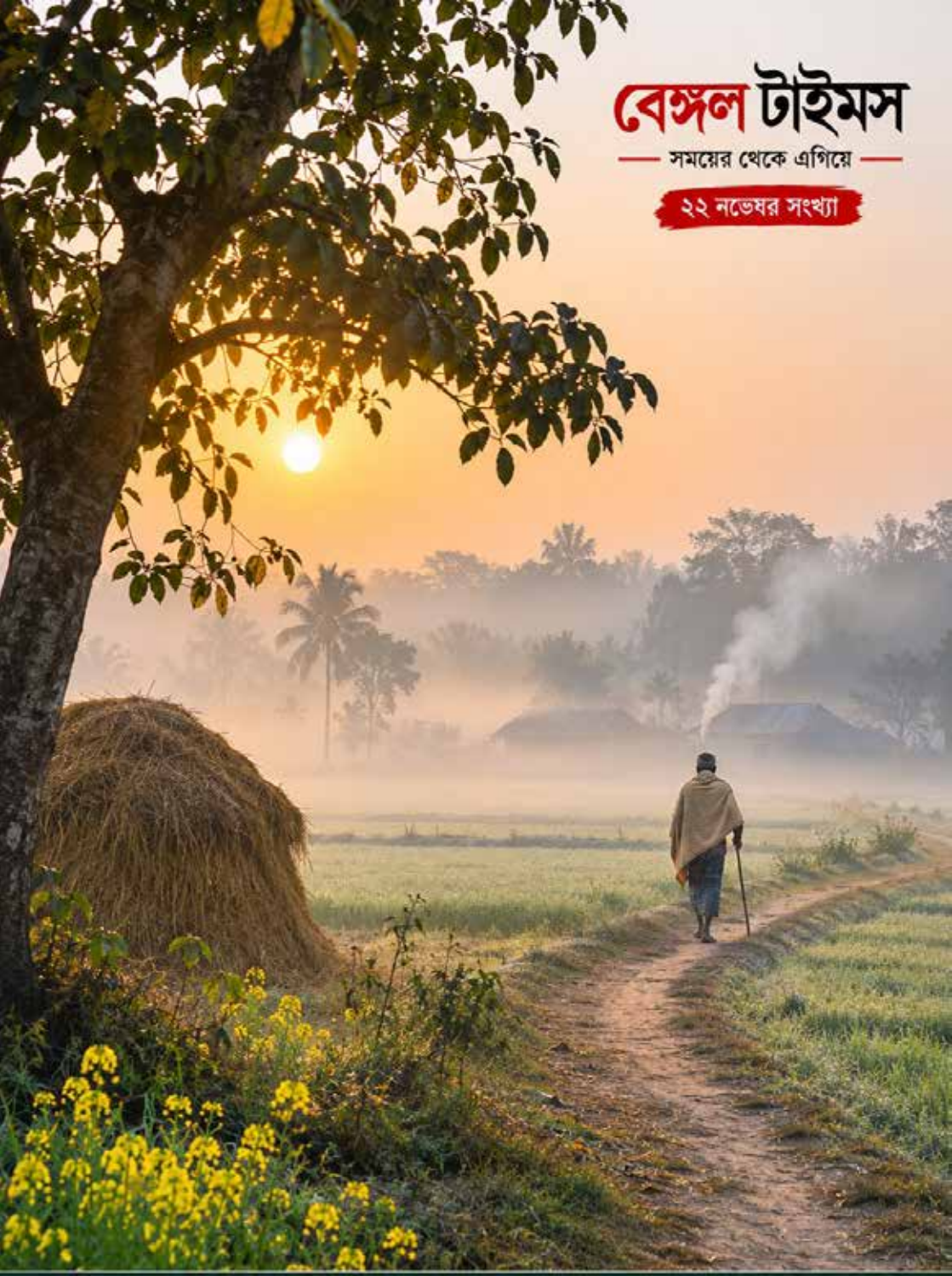
সবমিলিয়ে দুদিনের ট্যুরটা মন্দ হয়নি। মাঝে মাঝে রোদ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি। গ্রাম্য কিছু দোকান। ইচ্ছেমতো মোমো, সিঙ্গাড়া খাওয়াই যায়। কতরকম ফলের গাছ। গোটা গ্রামটাই যেন নিজেদের গ্রাম। যেন যার ঘরে যখন খুশি ঢুকে পড়া যায়। ইচ্ছে হল, একজনের বাড়িতে চা খাব। এক আন্টিকে বলামাত্রই হাসিমুখে রাজি। তিনি চা করে আনলেন। চা-টা যে দারুণ এমন নয়। কিন্তু ওই আতিথেয়তা! সত্যিই তুলনা হয় না। মানুষগুলো কত সহজ-সরল। একবার ভাবুন তো বেহালায় বা বরানগরে কোনও বাড়িতে গিয়ে আপনি চা খেতে চাইছেন। ইভটিজার বা চোর ভেবে গণপিটুনিও জুটে যেতে পারে। অথচ, ওঁরা কত সহজ-সরল। কত অতিথি বৎসল। ওঁদের ওই হাসিমুখগুলো দেখে আমাদেরও যেন আবদার করতে সংকোচ হয় না।

আবার যদি কখনও সুযোগ পাই, সেই গ্রামে যাব। জানি না, কখন যাওয়া হবে। যাঁরা এই লেখা পড়ছেন, তাঁরা চাইলে ঘুরে আসতে পারেন। নেটে চিমনি লিখে সার্চ মারলেই অনেক ছবি, তথ্য পেয়ে যাবেন। দুটো দিন নিরিবিলি পাহাড়ি গ্রামে ঘুরে আসতে চাইলে আপনার ঠিকানা হতেই পারে চিমনি।

বেঙ্গল টাইমস

সময়ের থেকে এগিয়ে

২২ নভেম্বর সংখ্যা



bengaltimes.in | ISSN 2445 5657